লেখকের কথামুখ

ছোটোগল্প লেখা লেখকের কাছে একঝলক দখিনা বাতাসের মতো, কারণ কঠিন পরিশ্রমের হাত থেকে কোথাও কোথাও যেন এটি মুক্তির বার্তা বহন করে আনে। উপন্যাস রচনা, সে লেখা ভালোই হোক বা মন্দ, ছাপার যোগ্য হোক বা অযোগ্য, তাতে প্রচুর পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে। উপন্যাসের বিপুল শব্দসংখ্যা, সে ষাট হাজার থেকে এক লক্ষও হতে পারে, ভাবনাতে এলে প্রথমেই মনে হয় ভীতিপ্রদ এবং স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘ সময়ব্যাপী একান্ত মনঃসংযোগও জরুরি। যদিও আমার উপন্যাসগুলি এখনকার হিসেবে বেশ ছোটো মাপের, তবু যখন কোনো উপন্যাস লেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখি, বড়ো ছটফটানি হয় আর অস্বস্তিও। মনে হয় আমাকে যেন মাসের পর মাস কোনো শিকল দিয়ে একটি খুঁটিতেই বেঁধে রাখা হয়েছে। এইসব সময়ে মনের মধ্যে জমতে থাকে বাক্যের ওপর বাক্যের পাহাড়। ঝাঁক ঝাঁক শব্দ, যা এইমাত্র লিখে উঠলাম বা যা লেখা বাকি ...সবকিছু ঝনৎকার তোলে কানের ভেতরে। অন্য সব ধ্বনি, সব ইন্দ্রিয় যেন অশ্রুত আর স্থবির হয়ে পড়ে। প্রথম খসড়া একটা ঠিকঠাক জায়গায় এসে পৌঁছোনোর পরে মনের গুরুভার খানিক লাঘব হয় বটে, কিন্তু সে-ও স্বল্পমেয়াদি। প্রথম খসড়া থেকে দ্বিতীয় খসড়া, সেখান থেকে হয়তো তৃতীয় বা চতুর্থ, যতক্ষণ পর্যন্ত না একেবারে নিখুঁত হচ্ছে; অনেকটা বলা যেতে পারে এ যেন এক বিচিত্র কল্পলোকের অনুসন্ধানে ফেরা। আর তারপর এমন একটা দিন আসে, যেদিন লেখক আচমকা ঠিক করেন এবার সবকিছু গুটিয়ে ফেলতে হবে আর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন নিজস্ব প্রতিনিধির কাছে।

একটি করে উপন্যাস শেষ করেছি আর প্রতিজ্ঞা করেছি যে এই শেষ, আর উপন্যাস লিখব না! সেই মুহূর্তে ছোটোগল্পের দেবতা প্রসন্ন হাসি হেসেছেন, মনে হয়েছে লিখেই ফেলি একটা দুটো ছোটোগল্প! বড়ো ভালো লাগে আমার ছোটোগল্প লিখতে। এ তো ঠিক উপন্যাস নয়, যে ছোটো ছোটো ফোঁড় তুলে একটা মস্ত বড়ো নকশিকাঁথা তৈরি হবে, তাতে সবকিছু খুঁটিনাটি নিজস্ব জায়গা পাবে বিশেষ নৈপুণ্যে। ছোটোগল্প লিখতে সবচেয়ে জরুরি হল বিশদে না গিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া, সামান্য ইঙ্গিত... শুধু কেন্দ্রে থাকবে একটি মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু বা শীর্ষচমক।

ভারতবর্ষের লেখকদের কাছে ছোটোগল্প লেখার বিষয়বৈচিত্র্য সীমাহীন।

উত্তরাধিকারসূত্রে যে যে বর্ণময় ও বিস্তীর্ণ সংস্কৃতি আমরা লাভ করেছি, তাতে অসংখ্য সফল ছোটোগল্প লেখা হতে পারে। এখানকার প্রতিটি মানুষ একে অন্যের থেকে আলাদা; শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক, অভ্যাসের তারতম্য আর দৈনন্দিন জীবনদর্শনেও। এই যে আমাদের সমাজ কোনো বিশেষ ছকে বাঁধাধরা নয় বা যান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ক্রীতদাস নয়, এর জন্যই আমরা একঘেয়েমিতে ভুগি না। এমন পরিস্থিতি আর পারিপার্শ্বিকতায় লেখককে শুধু নিজের মনের জানলাটি হাট করে খুলে ফেলে বাইরে তাকাতে হবে, যাতে ঠিক চোখে পড়ে যাবে কোনো বিশেষ চরিত্র আর তা থেকে উঠে আসবে না-লেখা গল্প।

ছোটোগল্প মানে তা কলেবরে ছোটো হওয়া জরুরি। অন্তত এই একটি বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু ছোটোগল্পের সংজ্ঞা ঠিক কী, তা এক এক ক্ষেত্রে এক একভাবে নির্ধারিত। সাংবাদিকের নিরিখে একরকম, আবার সাহিত্যবোদ্ধাদের বিচারে তা নির্ধারণ করা হয় বিষয়বস্তু, শীর্ষচমক, গঠনসৌকর্য আর বুনন দিয়ে; সঙ্গে থাকে লেখকের ওপরে আরোপিত হরেকরকম নিয়মনীতির বোঝা। নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, তখনই গল্প খুঁজে পাই ... যখন দেখি কোনো মানুষ কোনো মানসিক বা পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্বের শিকার। এই সংকলনে ত্রিশটির সামান্য বেশি কাহিনির প্রায় সবক'টিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি কোনো না কোনো ঘটনাপ্রবাহের শিকার এবং হয় সে সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছে অথবা তা সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকছে। কিন্তু কয়েকটি গল্প এমনও আছে, যেগুলি কারও জীবনের কোনো একটি বিশেষ বা উল্লেখযোগ্য মুহূর্তকে বা অস্তিত্বের এক নির্দিষ্ট নকশাকেই শুধু উপজীব্য করে বোনা।

এই সঙ্কলনের নাম দিয়েছি 'মালগুডি ডেজ়'। একটি মাত্র কারণেই এমন নামকরণ, যাতে একটা ভৌগলিক অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। 'মালগুডি জায়গাটা ঠিক কোথায়?' অসংখ্যবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে এই জায়গাটির নাম সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং কোনো মানচিত্রেই এটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস যে সাহিত্যনির্ভর মানচিত্র প্রকাশ করেছে, তাতে ভারতবর্ষের মানচিত্রে মালগুডি জায়গা করে নিয়েছে। যদি বলি, মালগুডি দক্ষিণ ভারতের একটি ছোটো শহর, তাহলে তা নিছকই অর্ধসত্য; কারণ মালগুডি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সার্বভৌমত্বের দাবিদার।

মালগুডির চরিত্রদের তো নিউ ইয়র্কেও দেখতে পাই : এই যেমন ১৯৫৯ সাল থেকে মাসের পর মাস, একটানা না হলেও ছাড়াছাড়াভাবে, আমি যে ওয়েস্ট টোয়েন্টি-থার্ড স্ট্রিটের বাসিন্দা, সেখানেও মালগুডির সব চেনা বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় অঞ্চলটির নিজস্ব চরিত্র আর মানুষজনের মধ্যে। সেখানে তো সত্যিই তেমন তফাত কিছু চোখে পড়ে না! সিনাগগের সিঁড়িতে এলোমেলো পায়ে মদ্যপ, দোকানে ঝাঁ চকচকে অক্ষরে ঘোষণা করা যে এই দোকানের সব জিনিস জলের দরে বিক্রি

করা হবে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে, সব পণ্যে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড়, চুলকাটার সেলুন, দাঁতের ডাক্তার, উকিল। সাজানো আছে মাছ ধরার রকমারি ছিপ, হুইল, বড়শি, চার। পসরা সাজানো রয়েছে থরে থরে 'লে লে বাবু চার আনা, যা নিবি তাই চার আনা' মার্কা দোকানে। মুখরোচক খাবারদাবারের দোকানি আমাকে দেখে এখানেও সাদর সম্ভাষণ করে জানতে চায়, 'এতদিন দেখিনি কেন? আজকাল দুধ, চাল কোত্থেকে কিনছেন?' তার মাথাতেই নেই যে আমি এই টোয়েন্টি-থার্ড স্ট্রিটের সারাবছরের বাসিন্দা নই, এমনকি সারাবছর আমেরিকাতেও থাকি না! সকলেই একসঙ্গে মিলেমিশে আছে নিজেদের মতো করে, স্থায়ী ঠিকানা আর চেনা মুখের মিছিল সম্বল করে। আর বলতে হবে চেলসি হোটেলের কথা, যেখানে গিয়েছিলাম বহু বছর পরে। ম্যানেজার আমাকে চিনতে পেরে লাফিয়ে উঠলেন খুশিতে, জড়িয়ে ধরলেন, হাঁকডাক করে জড়ো করলেন যাবতীয় কর্মচারীদের, অথবা সেই আগের আমলের যারা এখনও জীবিত ...যাতে সকলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। কী আর বলব, এমনকি হুইলচেয়ারবন্দি সেই অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও, এখন যাঁর বয়স একশো ষোলো বছর। ইনি বহু বছর যাবত এই হোটেলের স্থায়ী বাসিন্দা। যখন শেষবার এই হোটেলে আসি, তখন পরিচয়। মানুষটি নব্বইয়ের কোঠায় পা দিয়ে সেই যে এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন, এখনও ঠিকানা বদলাননি।

মালগুডি একটি ধারণামাত্র, কিন্তু আমার অভীষ্টসাধনে সফল। যতই আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হোক না কেন, একে আর কোনোভাবে বাস্তবের নির্দিষ্ট মাটিতে টেনে আনতে পারব না। লন্ডনের একজন উৎসাহী টেলিভিশন প্রযোজক আমাকে সাম্প্রতিককালে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাঁকে মালগুডি অঞ্চলটি ঘুরিয়ে দেখাই এবং আমার লেখার চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তাহলে তিনি এক ঘণ্টার একটি তথ্যচিত্র তৈরি করতে পারবেন। এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নম্রভাবে জানাই যে, 'এখন একটি নতুন উপন্যাসের কাজ নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে ...'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর একটি মালগুডি উপন্যাস?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'এটি কী নিয়ে?'

'একটা বাঘের শরীরে মানুষের আত্মা ছিল...'

'ওঃ, শুনেই কৌতূহল জাগছে! যাক গে, আমি না হয় অপেক্ষা করব। আমার ছবিটাতে যদি কোনোভাবে একটা বাঘ ঢুকিয়ে দিতে পারা যায় ...'

আর. কে. নারায়ণ